বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

— মোহাম্মদ সফিউর রহমান

বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন যদিও বৃটিশ আমলে, তবুও সুলতানী ও মোগল আমলের বিচার ব্যবস্থা এর পূর্বসুরী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলের 'নেজামত আদালত' ইত্যাদি পুরনো সুলতানী আমলের আদালতসমূহের উত্তরসূরী। বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে কাজী সিরাজের এক বিধবার নালিশের প্রেক্ষিতে স্বয়ং সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে আদালতে তলব করে নেয়া এবং বিধবার পক্ষে রায় দেয়া এবং সুলতানের সে রায় মেনে নেয়া আইনের শাসনেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মোগল আমলেও 'কাজিউল কুজাত' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় কাজী বা বিচারক নিয়োজিত ছিলেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সুবা, সরকার, পরগণা ও গ্রামে বিভক্ত করেন এবং যথাক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবাদার, ফৌজদার, আমীল, মোকাদ্দাম ও পাটোয়ারী রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব বিষয় ছাড়াও আইন শৃংখলা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয়ভাবে 'মুহ্তাছিব' ছিলেন সর্বসাধারণের জীবনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। মোহ্তাছেবকে অনেকটা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া দেশসমূহের 'ওমবুড্স্ম্যান' বা যুক্তরাজ্যের 'পার্লামেন্টারী কমিশনার' এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

এ দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রারম্ভ হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলের ১৭৮৬ সনের কথা স্মরণ করা যায়। ঐ সনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে কতকগুলো কালেক্টরসিপে বিভক্ত করা হয়— প্রত্যেকটাকে এক একজন ইউরোপীয় কালেক্টরের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং কালেক্টরকে সিভিল জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট–এর ক্ষমতাও দেয়া হয়। অবশ্য কয়েক বছর পর পৃথক জেলা জজের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮২৯ সনে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক–এর সংস্কার অনুযায়ী কমিশনার অব রেভিনিউ এণ্ড সার্কিট পদ সৃষ্টি করা হয়। এর পূর্বে কোর্ট অব এপীল ও সার্কিট বিদ্যমান ছিল। রাজস্ব আদায় দেখাশুনা করা ছাড়াও কমিশনারদেরকে ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৮৩৩ সনের ৩নং আইনে অবশ্য কমিশনারদেরকে বিচারকের দায়িত্ব থেকে ১৮৩৫ সন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি আমলে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদেরকে কোন কোন বিষয়ে ফৌজদারী বিচারকার্যও পরিচালনা করতে হতো।

দেওয়ানী আদালতের ব্যাপারে ১৮৮৭ সনের দেওয়ানী আদালত আইন দ্বারা অধঃস্তন আদালত-সমূহ সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য এ আইন দ্বারা উক্ত বিষয়ে ১৮৭১ সনের ৬নং আইন বাতিল হয়ে যায়। দেওয়ানী আদালত আইনে ১৮৮৭ অনুযায়ী (ধারা–৩) জেলা জজ, অতিরিক্ত জজ, সাব–অর্ডিনেট জজ ও মুনসেফ–এর আদালত আমলে আসে। ১৮৬১ সনের হাইকোর্ট আইন উর্ধ্বতন আদালত সম্পর্কে উল্লেখ্য–যার ফলে ১৮৬২ সনের লেটারস পেটেন্ট দ্বারা কোলকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৫ এর নতুন লেটারস পেটেন্ট দ্বারা এর পূর্ণ কার্যক্রম ও পদ্ধতি বিবৃত হয়।

অতঃপর ১৮৬৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ১৯১৯ সালে লাহোর হাইকোর্ট, ১৯২২ সালে রেঙ্গুন হাইকোর্ট এবং ১৯৩৬ সালে নাগপুর হাইকোর্ট স্থাপিত হয়।

ঢাকা হাইকোর্ট ১৯৪৮ সনে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর আওতায় গঠিত হয়। উক্ত আদেশে বলা হয়,

> The High Court of East Bengal shall be a court of record and shall have in respect of territories for the time being included in the province of East Bengal all such appellate and other jurisdictions under the law inforce immediately before the appointed day as exercisable in respect of the said territories by the high court of Calcutta.[১]

যেহেতু সাবেক পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ১৯৫৬ সনে রচিত হয় কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী হাইকোর্ট অফ ইষ্ট বেঙ্গল-এর বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালিত হয়। ইষ্ট বেঙ্গল হাইকোর্ট কোলকাতা হাইকোর্টের সব ক্ষমতাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম কোলকাতা হাইকোর্টের আওতাধীন ছিল না, কাজেই পরবর্তীতে তা ঢাকা হাইকোর্টেরও এলাকার বাইরে থাকে।[২] তাছাড়া ১৯৫৫ সনের আগে ঢাকা হাইকোর্টের রীট এখতিয়ারও ছিল না। ঐ সনে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ২২৩ (এ) ধারা মোতাবেক ঢাকা হাইকোর্টকে রীট এখতিয়ার অর্পণ করা হয়।

পরবর্তীতে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টসমূহ পরিচালিত হয়। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, প্রধান বিচারপতি ও অনুর্ধ অন্যান্য ৬জন বিচারকসহ সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে। তবে পার্লামেন্ট আইন দ্বারা উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। সুপ্রীমকোর্টকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যকার কোন বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ সম্পর্কে ঘোষণামূলক রায় দেয়ার মূল এখতিয়ার দেয়া হয়, যদি তা সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত হয়ে থাকে।[৩] এতদ্ব্যতীত সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান অন্যূন ১৫,০০০ টাকার দেওয়ানী মামলার এবং হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালতের রায়ের বিপরীতে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিষয়ে আপীল এখতিয়ার প্রদান করা হয়।[৪]

উক্ত সংবিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় প্রদেশে এক একটি হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট গভর্ণরের সাথে আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হাইকোর্টের বিচারপতিদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। কমপক্ষে হাইকোর্টে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবি অথবা ১০ বছরের বিচার বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা

---

১ হাইকোর্ট অফ বেঙ্গল আদেশ ১৯৪৭, প্যারা-৫।

২ Eklas V. Crown 7 DLR 552.

৩ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1956 Art. 156.

৪ Ibid, Art. 157, 158, 159.

অন্ততঃ ৩ বছর জেলা জজ হিসাবে কাজ করেছেন এ রকম কোন অন্যূন ১০ বছরের সিনিয়র সি এস পি অফিসারকে হাই কোর্টের জজ করা যেতে পারে বলে বলা হয়।[৫]

ঐ সংবিধানের আরোও উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, হাইকোর্টকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে রীট গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয় এবং habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari রীট এর উল্লেখ করা হয়।

পাকিস্তানের ১৯৬২ সনের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের জজদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৬] হাইকোর্টে বিচারক হিসাবে অন্ততঃ ৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা হাইকোর্টে অন্ততঃ ১৫ বছর এডভোকেট হিসাবে দায়িত্ব পালন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগের শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রধান বিচারককে সরাসরি এবং অন্যান্য বিচারকদেরকে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারাবলীর মধ্যে মূল, আপীল সংক্রান্ত ও পরামর্শ প্রদানমূলক এখতিয়ার রাখা হয়। যখন হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কোর্ট অবমাননার দণ্ড প্রদান করবে অথবা কোনও বিষয়ে সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত আছে বলে প্রত্যয়ণ করবে, সে সকল অবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট আপীল শ্রবণ করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৭] সংবিধানে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, যদিও সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী সীট ইসলামাবাদে থাকবে তবুও বছরে অন্ততঃ দু'বার সুপ্রীমকোর্ট ঢাকায় আহূত হবে।[৮]

উক্ত সংবিধানেও প্রত্যেক প্রদেশের জন্য হাইকোর্টের ব্যবস্থা রাখা হয়। হাইকোর্টে আইনজীবি হিসাবে অন্ততঃ ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা ১০ বছর বিচারক হিসাবে অভিজ্ঞতা অথবা অন্ততঃ ৩ বছর জেলা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালনসহ ১০ বছরের সিভিল সার্ভিসের অভিজ্ঞতা বিচারক হিসাবে নিয়োগের শর্ত হিসাবে রাখা হয়। হাইকোর্টের এখতিয়ার সমূহের মধ্যে রীট এখতিয়ারও রাখা হয়, যদিও পূর্বেকার সংবিধানের মত রীটের নাম উল্লেখ করা হয়নি।[৯]

স্বাধীনতা উত্তর কাঠামো

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ১১ই জানুয়ারী ১৯৭২-এ ঘোষিত অস্থায়ী বাংলাদেশের সংবিধান আদেশ ১৯৭২-এ নিম্নরূপ বর্ণিত হয়ঃ

There shall be a High Court of Bangladesh consisting of a Chief Justice and so many other Judges, as may be appointed from time to time.[১০]

---

৫ Ibid, Art. 165, 166, 167.
৬ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1962, Art. 49.
৭ Ibid, Art. 58.
৮ Ibid, Art. 56.
৯ Ibid, Art. 92, 98
১০ Provincial Constitution of Bangladesh Order 1972, Art. 9.

অতঃপর ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৫ হিসাবে The High Court of Bangladesh order ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭২-তে ঘোষিত হয়। উক্ত আদেশে হাইকোর্টের মূল, আপীল বিষয়ক ও অন্যান্য এখতিয়ার নিম্নোক্তভাবে উল্লেখিত হয়ঃ

The High court of Bangladesh shall be a Court of Record, and shall have, in respect of the territories of Bangladesh, all such original, appellate, special, revisional, review, procedural and all other powers as were exercisable in respect of the said territories by the High Court at Dacca under any law in force before the 26th day of March, 1971 :

Provided that the High Court of Bangladesh shall have no power to issue any writ, order or direction in nature of habeas corpus, mandamus, probibition, or declaration, which the High Court at Dacca had power to issue under any constitutional provision in force before the 26th day of March, 1971.[১১]

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম হাইকোর্টকে সাবেক হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার ব্যতীত অন্যান্য সকল এখতিয়ারই অর্পণ করা হয়। কিন্তু এতে একদিকে যেমন হাইকোর্টের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা ছিল না অন্যদিকে সরকার মামলায় কোন পার্টি হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ ছিল না। এ অসুবিধা দূরীকরনার্থে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২-এ The Bangladesh (legal proceedings) order 1972 (President's order No. 12 of 1972), ১৫ই জুন ১৯৭২ -তে the Bangladesh (legal proceedings) (second order 1972) (President's order No. 69 of 1972) ২রা আগষ্ট ১৯৭২-এ The Bangladesh (legal proceedings) (Third) order 1972 (President's order No. 90 of 1972) এবং ২রা আগষ্ট ১৯৭২-এ The High Court of Bangladesh (Amendment) order 1972 (President's order No. 91 of 1972) জারী করা হয়। শেষোক্ত আদেশে একটি নতুন ৬ (এ) অনুচ্ছেদ সংযোজন করত ঃ নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়ঃ

6A (I) There shall be an Appellate Division of the High Court of Bangladesh which shall consist of the Chief Justice and two other Judges to be appointed by the President after consultation with the Chief Justice:

provided that where any appeal or petition pending before the Appellate Division relates to any judgement or order passed by the Chief Justice or any other judge of the Appellate Division either sitting singly or as a judge of any High Court the President shall appoint an ad hoc Judge to sit in place of the Chief Justice or the other Judge for hearing the appeal or petition.

(2) All appeals and petitions, which immediately before the commencement of the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, were pending before the erstwhile Supreme Court of Pakistan arising out of matters within the territories of Bangladesh shall, on the commencement of the High Court of Bangladesh

---

[১১] The High Court of Bangladesh order 1972 (President's Order No. 5 of 1972) Art.4.

(Amendment) Order, 1972 (P. O. No. 91 of 1972), stand transferred to, and be deemed to be appeals and petitions pending before the Appellate Division and shall be continued in, and heard and determined by, the Appelate Division.[১২]

এতদ্ব্যতীত উক্ত আদেশে বলা হয় যে, যে সব রীটসমূহ ১৯৭২ সনের বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারীর পূর্বে কোন হাইকোর্টে বিদ্যমান ছিল সেগুলো বাংলাদেশের হাইকোর্টে স্থানান্তরিত বলে ধরা হবে। তবে এটা উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯১-তে সাবেক সুপ্রীম কোর্টের মত কোন কাঠামো সৃষ্টি করা হয়নি, বরং উক্ত আদেশ সাবেক পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারের একটি বিকল্প ছিল মাত্র।[১৩]

সাংবিধানিক রূপরেখা

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সনের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং ১৪ই ডিসেম্বর স্পীকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত হয়। উক্ত সংবিধান ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে কার্যকরী হয়। মূল সংবিধানে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট নামে বাংলাদেশের একটা সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে। বিচারপতিদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবে এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করতঃ রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগদান করবেন। বিচারক নিয়োগের শর্ত হিসাবে সুপ্রীমকোর্টে অন্যূন ১০ বছর কাল এডভোকেট হিসাবে কর্মরত থাকা অথবা ১০ বছর বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকা অথবা অন্যূন ১০ বছর এডভোকেট থাকা (ও অন্যূন ৩ বছর জেলা জজের ক্ষমতা নির্বাহ করা) রাখা হয়।[১৪] উক্ত সংবিধানে বলা হয় যে, কোন বিচারক ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।[১৫] আপীল বিভাগকে হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তা নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেয়া হয়। যেসব ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সার্টিফিকেট দান করেন যে, মামলাটির সাথে এ সংবিধান ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন বা উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ড দান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে আপীল বিভাগ আপীল শ্রবণ করবেন।[১৬]

---

১২ The High court of Bangladesh (Amendment) order 1972, (P.O. 91 of 1972) Art. 1.

১৩ দেখুন Ghazi Shamsur Rahman, " Supreme Court of Bangladesh : Its constitutional Evaluation (documented)" Administrative Science Review, Vol. IX No. 4, (December 1979), p/72.

১৪ দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২, অনুঃ ৯৪-৯৫, বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত (ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭২) পৃঃ ৩৪৩৭। শেষাংশ পরবর্তীতে বাদ দেওয়া হয়।

১৫ Ibid. , অনুঃ ৯৬, পৃঃ ৩৪ ৩৮।

১৬ Ibid. অনুঃ ১০৩, পৃঃ ৩৪৪০।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের মধ্যে আদি, আপীল ও অন্য প্রকার পূর্বার্পিত এখতিয়ার ও ক্ষমতা বলবৎ রাখা হয় বিশেষত ঃ সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগকে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংবিধানে অর্পিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার এখতিয়ার অর্থাৎ রীট এখতিয়ার প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে অবশ্য কতকগুলো পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। তন্মধ্যে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫-এ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী আইনে বিচারপতি অপসারণের ব্যাপারে জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা বিলোপ করত বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে কারণ দর্শাও করত অপসারণ করতে পারবেন।[১৭] পরবর্তীতে ২৩ শে এপ্রিল ১৯৭৭-এর আদেশে বলা হয় যে, সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের কোন জজকে অপসারণ করতে হলে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামত নিতে হবে এবং এ উপলক্ষে সুপ্রীম কোর্টের ৩ জন সিনিয়র জজের সমন্বয়ে উক্ত কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়।[১৮] অবশ্য তারপর ২৭ শে নভেম্বর ১৯৭৭-এ সর্বোচ্চ আদালতকে সুপ্রীম কোর্ট নামে অভিহিত করা হয় এবং সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ চিহ্নিত করা হয়।[১৯] অবশ্য ইতিপূর্বে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েমের আমলে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট সামরিক আইন ঘোষণা দ্বারা আলাদা সংগঠন হিসাবে দেখানো হয়েছিল। পরবর্তীতে সাময়িকভাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল বিলোপ করা হলেও সংবিধানের সংশোধনীক্রমে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।[২০] অবশ্য ২৪ শে মার্চ ১৯৮২ সনে সামরিক আইন ঘোষণার পর সাময়িকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের রীট এখতিয়ার স্থগিত রাখা হয়। ঘোষণায় বলা হয় যে, স্থগিত রাখা সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ভুত ও এর সাথে সম্পর্কিত সকল রীট আবেদনের শুনানী স্থগিত থাকবে।[২১] তবে উক্ত ঘোষণার পর পরই সামরিক আইন আদেশ নং-১-এ সুপ্রীমকোর্টকে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ১৯৮৫ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী The Constitution (partial revival) (2nd order) 1985-তে সংবিধানের সমতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার নং -২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৪০ ও ৪১ পুর্নবহাল করা হয়। অতঃপর ১০ই নভেম্বর ১৯৮৬-তে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী দ্বারা সংবিধান পুনরূদ্ধারের সাথে সাথে বিচারপতিদের বয়স সীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯ই জুন ১৯৮৮-তে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী আমলে আসে। বিচার বিভাগীয় বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা ছাড়াও কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চে গঠিত হয়। ১১ ই জুন ১৯৮৮-তে প্রধান বিচারপতির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী রংপুর বেঞ্চের এখতিয়ারে ১৬টি জেলা, বরিশাল বেঞ্চের এখতিয়ারে ৭টি জেলা, যশোর বেঞ্চের এখতিয়ারে ১০টি

---

১৭ The Constitution (4th Amendment) Act 1975 (Act No.11 of 1975) Sec. 15.

১৮ Proclamation Order No. 1 of 1977 Art. 7 (i).

১৯ Second proclamation Order No 1 of 1977 Art. 94.

২০ The Constitution (partial revival) Order 1985.

২১ ২৪-৩-৮২ ইং তারিখের সামরিক আইন জারীর ঘোষণাপত্র (ছ) দ্রষ্টব্য, দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক ২৫ শে মার্চ ১৯৮২, পৃঃ ১, ৮।

জেলা, সিলেট বেঞ্চের এখতিয়ারে ৪টি জেলা, কুমিল্লা বেঞ্চের এখতিয়ারে ৬টি জেলা, চট্টগ্রাম বেঞ্চের এখতিয়ারে ৩টি জেলা প্রতিস্থাপিত হয় এবং অবশিষ্ট জেলাগুলো ঢাকা বেঞ্চের আওতাধীন করা হয়। পরবর্তীতে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের রায়ে উক্তভাবে বেঞ্চ গঠন অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২] সরকার উক্ত রায় মেনে নিয়েছেন। তবে ৪র্থ জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশনে বিষয়টি পূনরালোচিত হয়েছে। বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে ৫ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় ২৯ জন বিচারপতি রয়েছেন। আপীল বিভাগের বিচারকরা সাধারণতঃ ফুলবেঞ্চে একত্র বসে আপীল শুনেন। হাইকোর্ট বিভাগের একক বিচারক বিচারালয়কে সিংগল বেঞ্চ, দুজন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চকে ডিভিশন বেঞ্চ এবং তিন বা ততোধিক বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চকে ফুল বেঞ্চ বলা হয়ে থাকে।

হাইকোর্টের এখতিয়ারসমূহের মধ্যে মূল ও আপীল এখতিয়ার এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী এখতিয়ার রয়েছে। কোম্পানী আইন, এডমিরালটি আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ এখতিয়ার। 'রীট' হাইকোর্ট বিভাগের একটা মূল দেওয়ানী এখতিয়ার। এর আপীলসমূহ আপীল বিভাগ শ্রবণ করেন। ভারতে অবশ্য রীট হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট উভয় আদালতেই শুরু করা যায়। সংবিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ অন্যান্য সকল অধঃস্তন আদালত সমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং আপীল বিভাগের রায়সমূহ হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং উভয় বিভাগের রায়সমূহ অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক।[২৩] হাইকোর্ট বিভাগ অধঃস্তন আদালত সমূহ পরিচালনার জন্য বিধিমালাও প্রণয়ন করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত সুপ্রীমকোর্টের উভয় বিভাগেরই রিভিশন্যাল ও রিভিউ ক্ষমতা রয়েছে।

জেলা ও দায়রা জজ

জেলা ও দায়রা জজের আদালত দুইটি প্রবাহ থেকে সৃষ্ট। দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত এখতিয়ারের জন্য বিচারপতিকে জেলা জজ এবং ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত এখতিয়ারের জন্য দায়রা জজ বলা হয়ে থাকে। 'দায়রা' শব্দটি আরবী, যার মানে হচ্ছে, 'ঘোরা' বা 'সার্কিট'। দেওয়ানী ক্ষমতাসম্পন্ন জজ একাধিক স্থানে ঘুরে ফৌজদারী মামলারও আপীল শুনতেন বলে তাকে দায়রা জজ নামাকরণ করা হয়। কোর্ট অফ সার্কিট–এর সৃষ্টির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বছররের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদালতের সেশন বা অধিবেশন করতে হতো বলে উক্ত আদালতকে সেশনস কোর্টও নামাকরণ করা হয়— যথা : সিলেটের জজকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে কাছাড়ের শিলচরে গিয়ে সেশন বা অধিবেশন করতে হতো। পরবর্তীতে কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধকে সেশনস কেস্ নাম দেয়া হয়। যথা : খুন, ডাকাতি, ঘর পোড়ানো ইত্যাদি।

জেলা জজের আদালত ও অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহ ১৮৮৭ সালের সিভিল কোর্টস আইন দ্বারা সৃষ্ট এবং ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি–এর বিস্তারিত কার্য পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। অধুনা ১৯৮৩ সনের অধ্যাদেশ নং–২ দ্বারা অবশ্য সিভিল কোর্ট আইনের কয়েকটি পরিবর্তন

---

২২ 1989 BLD (SPL) ১

২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুঃ ১০৯ ও ১১১।

সাধিত হয়েছে এবং অধ্যাদেশ নং ৪৮ দ্বারা দেওয়ানী কার্যবিধির বেশ কয়েকটি রদবদল করা হয়েছে। সিভিল কোর্ট আইন জেলা জজের আদালত, অতিরিক্ত জজের আদালত, সাবঅর্ডিনেট জজের আদালত ও মুন্সেফের আদালত (পরবর্তীতে সহকারী জজের আদালত) কাঠামো বর্ণনা করেছে।[২৪] জেলা জজ তাঁর এলাকার অন্যান্য দেওয়ানী আদালতসমূহ তত্বাবধান করে থাকেন। জেলা জজের মূল, আপীল ও রিভিশন্যাল এখতিয়ার রয়েছে। জেলা জজ সাধারণতঃ মূল মামলা স্বয়ং বিচার করেন না। কিন্তু কতকগুলো আইনে তাঁকে বিশেষ বিষয়ে একমাত্র বিচারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে যথা : দেউলিয়া আইন, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার। তবে তিনি তাঁর কোন কোন কাজ ডেলিগেটও করতে পারেন। তিনি সাবঅর্ডিনেট জজদের রায় অথবা আদেশের আপীল শুনেন যদি মামলার মূল্য ~~৭৫,০০০/-~~ ২,৫০,০০০/- টাকা অথবা তদুর্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সহকারী জজদের সকল রায় বা আদেশের উপরই তাঁর কাছে আপীল হতে পারে। জেলা জজের আপীলের উপর দ্বিতীয় আপীলের ব্যবস্থা নেই, তবে হাইকোর্ট বিভাগ তা রিভিশন করতে পারেন।

বৃটিশ আমলে সেশনস কেসসমূহের বিচার কার্যে জুরির ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রজ্ঞা যাতে বিচারকার্যে কাজে লাগানো যায় সে জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যথা : ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট, স্কুল বা মাদ্রাসা শিক্ষক প্রমুখকে জুরর হিসাবে বিভিন্ন কেসে নিয়োগ করা হতো। মামলায় জুরি question of fact নির্ধারণ করতেন যে আসামী দোষী না নির্দোষ, পক্ষান্তরে question of law বিচারক নির্ধারণ করতেন। বিচারককে জুরর রায় মেনে নিতে হতো। পরবর্তীতে জুরির পরিবর্তে এসেসার নিয়োগ করা হতো। এসেসারদের মতামত নিতে অবশ্য বিচারক বাধ্য ছিলেন না। তবে তাঁদের মতামত বিচারক অবশ্যই বিবেচনা করতেন।

১৯৫৭ সনের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ২৩ নং আইনে বিচার ব্যবস্থার কতকগুলো সবিশেষ পরিবর্তন সাধন করা হয়। জুরি ব্যবস্থা রহিত ছাড়াও ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে বিচার কার্যের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্তে জেলা জজের কাছে দায়ী করার ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম।

পূর্বে সেশন জজের রিভিশন্যাল ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ১৯৭৬ সনের আইন সংস্কার কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৯৭৮ সনের আইন সংস্কার অধ্যাদেশে ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৪৩৯ (ক) ধারা যোগ করত (১৯৭৯ সনের ১ লা জুন থেকে কার্যকরী) সেশন জজকে রিভিশন্যাল ক্ষমতাও দেয়া হয়। অধঃস্তন কোর্টসমূহের যে সমস্ত রায় বা সিদ্ধান্ত আপীলযোগ্য নয়, সে গুলো সেশন জজ রিভাইজ করতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে, রায় বা সিদ্ধান্তে কোন আইনের ভুল থেকে গেছে। তবে জেলা জজের দেওয়ানী রিভিশন ক্ষমতা ১৯৮৩ সনে বিলোপ করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা জজের দায়িত্ব জেলা জজের মতই। যে মামলাগুলো জেলা জজ তাঁকে ট্রান্সফার করেন সেগুলোর বিচারকার্য তিনি পরিচালনা করেন।

---

২৪ The Civil Courts Act, 1887, Sec.3.

সাব-জজ ও সহকারী জজ

কোন জেলায় এক বা একাধিক সাব-জজ থাকতে পারেন। প্রতি সাব জজের এলাকা হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন জেলা জজ কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং আদালতের স্থান সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। একজন সাব জজের দু'ধরণের ক্ষমতা থাকে—মূল ও আপীল সংক্রান্ত। সাধারণত ঃ তিনি ২০,০০০/- টাকার ঊর্ধ্বের মূল্যমানের মামলাসমূহ বিচার করে থাকেন। তবে তাঁর কাছে পেশকৃত আদিম মামলার মূল্যমানের কোন সীমারেখা নেই। জেলা জজ সাব জজকে সহকারী জজদের মামলার আপীল শুনানীরও দায়িত্ব দিতে পারেন। কোন কোন সাব জজ ও সহকারী জজকে ১৮৮৭ সনের Small Cause Courts Act অনুযায়ী small causes মামলাসমূহ বিচারেরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। সাব জজের রায় ও আদেশের উপর ৭০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জেলা জজ আপীল শুনতে পারেন এবং এর উপরের মূল্যমানের আপীল হাইকোর্ট বিভাগ গ্রহণ করে থাকেন।[২৫]

সিভিল কোর্টসমূহের সর্ব নিম্নস্তরে সহকারী জজকোর্ট রয়েছে। সহকারী জজদেরকে পূর্বে 'মুন্সেফ' বলা হতো। শব্দটা আরবী, যার মানে হচ্ছে—ন্যায়বিচারকারী। সম্প্রতি উক্ত নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। মুন্সেফের মূল ও রিভিশন্যাল এখতিয়ার রয়েছে। সাধারণত মুন্সেফরা ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলাসমূহের শুনানী নেন। তবে কিছু নির্ধারিত সংখ্যক সিনিয়র মুন্সেফকে হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিশক্রমে ~~৫০,০০০/-~~ ২০০০০/- টাকা পর্যন্ত মামলা শুনানীর ক্ষমতা সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রদান করতে পারেন। সহকারী জজের কোর্টের আপীলসমূহ জেলা জজ-এর কোর্টে করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সহকারী জজকে small causes কোর্টেরও দায়িত্ব দেয়া হয়। পারিবারিক আদালত আইনে অনেক সহকারী জজ পারিবারিক আদালতেরও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সহকারী জজের আদালত গ্রাম্য আদালত ও সালিশী বোর্ডের ক্ষুদ্র দেওয়ানী বিষয়সমূহের রায়ের রিভিশন্যাল ক্ষমতাও রাখেন।[২৬]

সহকারী ও সাব জজদের আদালতে ইনজাংকশন-এর আবেদনসমূহও শুনানী হয়ে থাকে। দেওয়ানী কার্যবিধির Order XXXIX, rule 1&2 অনুযায়ী সহকারী ও সাব জজগণ interlocutary অথবা অন্তবর্তীকালীন দেওয়ানী ইনজাংকশন জারী করতে পারেন এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন ১৮৭৭-এর আওতায় স্থায়ী ইনজাংকশন জারী করে থাকেন।[২৭]

দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন

১৯৮৩ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশে দেওয়ানী কার্যবিধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে উক্ত কার্যবিধির ৪৭ নং ধারা বিলোপ সবিশেষ উল্লেখ্য। এটা ডিক্রী কার্যকরী মামলা

---

২৫ Sec. 21 of the Civil Courts Act. 1887, as amended by Ordinance-II of 1983.

২৬ The Village Courts Ordinance 1976 Sec. 4 (2) and the Conciliation of Disputes (Municipal Areas) Ordinance 1979, Sec. 4 (2).

২৭ Specific Relief Act 1877 Sec. 52-57 কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ইনজাংকশন জারী করা যায় না তা ঐসব ধারায় বর্ণিত আছে। ১৯৮৯ সনের ৩২ নং আইন অনুযায়ী সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রচেষ্টা বানচাল হয় এমন ক্ষেত্রেও ইনজাংকশন প্রদান করা যাবে না বলা হয়েছে।

সংক্রান্ত ছিল। এতে কোন মামলার ডিক্রী কার্যকরীকরণে দীর্ঘসূত্রিতার অবসান হয়। ১১৫ নং ধারা সংশোধনক্রমে জেলা জজের রিভিশন ক্ষমতা উঠিয়ে দেয়া হয় এবং উক্ত ক্ষমতা হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। তবে যে সমস্ত রিভিশন্যাল মামলা ইতিমধ্যেই জেলা জজের আদালতে ছিল সেগুলো তাতে ব্যাহত হবে না বলে বলা হয়। আরো বলা হয় যে, হাইকোর্ট বিভাগ কেবলমাত্র ঐ সব ক্ষেত্রেই রিভিশন করবেন যে গুলোতে সিদ্ধান্তের ভুলে ন্যায়বিচারের অন্যথা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন।

অন্যান্য সংশোধনীর মধ্যে সময়সীমা আনয়ন উল্লেখ্য। ২৬ নং অর্ডার সংশোধনক্রমে আদালত-কমিশনের প্রতিবেদনের সময়সীমা সাধারণভাবে ৩ মাসে সীমাবদ্ধকরণ তার মধ্যে উল্লেখ্য। ১৮ নং অর্ডারে একটা নতুন ১৯ নং বিধি যোগ করত ঃ বলা হয় যে, আদালত চূড়ান্ত শুনানীর তারিখ নির্ধারণের ১২০ দিনের মধ্যে শুনানী সমাপ্ত করবেন। ২০ নং অর্ডার সংশোধন করত উল্লেখ করা হয় যে, শুনানী সমাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে আদালত রায় ঘোষণা করবেন এবং আরো ৭ দিনের মধ্যে ডিক্রী ঘোষণা করবেন। এতদ্ব্যতীত ১৪ নং অর্ডার সংশোধন করতঃ বলা হয় যে, প্রথম শুনানীর ১৫ দিনের মধ্যে বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত অর্ডারে নতুন ৮ নং বিধি যোগ করত বলা হয় যে, বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণের ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত শুনানী শুরু করতে হবে।

ফৌজদারী আদালতসমূহ

ফৌজদারী আদালতসমূহের গঠন ও কার্যাবলী ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত। উক্ত আইনের ৬ নং ধারা সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য ফৌজদারী আদালতসমূহকে নিম্নোক্ত ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—

১। সেশন কোর্টসমূহ
২। মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতসমূহ
৩। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতসমূহ
৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতসমূহ
৫। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতসমূহ

সেশনস কোর্টের বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে জেলা জজকে যেমন সেশনস জজের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তেমনিভাবে অতিরিক্ত জেলা জজ এবং সাবজজদেরকে ফৌজদারী মামলার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সেশনস জজ ও সহকারী সেশনস জজরূপে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। সেশনস জজের এখতিয়ারের মধ্যেই মূল, আপীলকৃত ও রিভিশন্যাল এখতিয়ার রয়েছে। মূল এখতিয়ারের মধ্যে তিনি ফৌজদারী আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে কোন অপরাধের বিচার করতে পারেন। তবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে তা হাইকোর্ট কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত হতে হবে। আপীল এখতিয়ারের মধ্যে সহকারী জজ অথবা সহকারী সেশনস জজ অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ৫ বছরের জেল দিলে তা জেলা জজের কাছে আপীলযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নিম্নতর আদালত থেকে কোন মামলাকে জেলা জজ রিভাইস করারও এখতিয়ারপ্রাপ্ত।

সহকারী সেশনস জজ ৭ বছরের জেল দিতে পারেন। তবে ১৯৮২ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশে তাঁকে বিশেষ অবস্থায় অতিরিক্ত সেশনস জজের দায়িত্ব পালন এবং ফাঁসী ব্যতীত অন্যান্য সকল শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে।[২৮]

ম্যাজিস্ট্রেসী

ফৌজদারী কার্যবিধির ১০নং ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে ১৩ নং ধারানুযায়ী মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৮২ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশে নতুন ১৩(এ) ধারা সংযোজন করতঃ থানা ম্যাজিস্ট্রেট (পরবর্তীতে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটরূপে ক্ষমতাপর্ণ করতে পারেন এবং উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাবেক মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা থাকবে। তবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রিজোলিউশন অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ও ১৪৫ ধারার ক্ষমতা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রদান করা হয়েছে।[২৯]

১৯৮২ সনের ২৪নং অধ্যাদেশে একটি ২৯ (সি) ধারা যোগ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে ঐ সনের ৬০নং এবং ১৯৮৩ সনের ৪নং অধ্যাদেশ দ্বারা কিছুটা সংশোধিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকার কোন চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য নয় এমন সব অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিতে পারেন। অনুরূপভাবে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এমন সব মামলা বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতসমূহ নিম্নোক্ত প্রকার শাস্তি প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঃ[৩০]

ক) মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজেস্ট্রেটের আদালত	নির্জনে রাখার আদেশসহ ৫ বছর পর্যন্ত জেল ও ১০,০০০/= টাকা জরিমানা ও বেত্রাঘাত।[৩১]
খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত	নির্জনে রাখার আদেশসহ ৩ বছর পর্যন্ত জেল এবং ৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
গ) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত	২ বছর পর্যন্ত জেল এবং ২,০০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত হারে শাস্তি প্রদান ১৯৮২ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৭৮ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ জারীর পূর্ব পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ২ বছর পর্যন্ত জেল ও ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট দেরকে ৬ মাস পর্যন্ত জেল ও

---

২৮ Ordinance XXXVII of 1983.

২৯ Government of Bangladesh, Cabinet Division, Resolution on Reorganisation of the Administration at the Thana level (no. DA-12 (26) /82-449 dated 23rd October, 1982), vide 'Charter of duties of Thana (Later, Upazila) Nirbahi Officer.

৩০ Code of Criminal Procedute 1898 (as amended) sec. 32.

৩১ যদি ১৯০৯ সনের Whipping Act দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

ম্যাজিস্ট্রেট) এর ব্যবস্থা করা হয় । সরকার কোনও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর
LIBRARY

২০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ১ মাসের জেল এবং ৫০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা অর্পিত ছিল। উক্ত অধ্যাদেশে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ৩ বছরের জেল ও ৫,০০০/– টাকা জরিমানা করার, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ২ বছরের জেল ও ২,০০০/– টাকা জরিমানা করার এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ১ বছরের জেল ও ১,০০০/– টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় যা ১৯৮২ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ জারী হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন

বিগত দু'দশকে ফৌজদারী কার্যবিধির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথমতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮ নং অধ্যায় উঠিয়ে দিয়ে সেশনস কেসসমূহের বেলায় ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক শুনানী রহিত করা হয়েছে। পূর্বে সেশনস কেসের কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করতঃ আদালতে আনুষ্ঠানিক ইংক্বায়ারীর পর প্রয়োজনে দায়রা জজের আদালতে সোপর্দ করতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে দায়রা জজের আদালত সরাসরি ঐ ধরনের কেসসমূহ গ্রহণ করে থাকেন।

তবে সংশোধনীসমূহের মধ্যে ১৯৮২ সনের ফৌজদারী কার্যাবিধির ৩টি সংশোধনী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে বর্ণিত ৩২, ২৯ (সি) ও ৩৩ (এ) ছাড়াও ১৬৭ ধারা সংশোধন করতঃ পুলিশ তদন্তের সময়সীমা ৬০ দিনে সীমাবদ্ধকরণ যা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে আরো ৩০ দিন বৃদ্ধি করতে পারেন, ৩৩৯ (বি) ধারা ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংযোজন করতঃ অন্ততঃ একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অনুপস্থিত আসামীকে অনুপস্থিতভাবে বিচার করার ব্যবস্থা করণ, ৩৩৯ (সি) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার মামলা গ্রহণের সময় থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করার এবং দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজের ১২০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাকরণ উল্লেখ্য। অবশ্য তাঁরা যদি উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট বিচারকার্য নিষ্পত্তি না করতে পারেন তাহলে নিষ্পত্তি না করার কারণ উল্লেখ করতঃ আরো ৩০ দিন অতিরিক্ত সময় নিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৪৪২(এ) যোগ করত আপীল কোর্টের আপীল ও রিভিশনের সময়সীমা ৯০ দিনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কেস গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন পদ্ধতি ও ওয়ারেন্ট পদ্ধতি একীভূতকরণ, সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক মামলা অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি ফৌজদারী কার্যবিধির সংশোধনীসমূহের উল্লেখযোগ্য দিক।[৩২]

বিশেষ ধরনের আদালতসমূহ

বাংলাদেশের বিশেষ ধরনের আদালতসমূহের মধ্যে শ্রম আদালত, শ্রম আপীল আদালত, গ্রাম আদালত, সালিশবোর্ড আদালত, পারিবারিক আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুন্যাল, শিশু আদালত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রম আদালত ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ দ্বারা সৃষ্ট। শ্রম আদালতে একজন সভাপতি ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীর,

---

৩২ এ প্রসঙ্গে দেখুন Government of Bangladesh, Cabenet Division, Hand Book on Criminal Law Reforms, 1983, pp. 1-12.

পক্ষের দু'জন সদস্য থাকেন। তাঁরা শ্রম বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। তাঁদের প্রদত্ত আদেশ ও 'এওয়ার্ড'[৩৩] শ্রম আপীল আদালতে আপীলযোগ্য।

গ্রাম্য আদালতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত বাদী ও বিবাদী পক্ষ প্রত্যেকে দু'জন সদস্য মনোনয়ন দান করেন। তবে প্রত্যেক পক্ষের অন্ততঃ একজন মনোনীত সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে হতে হয়। উক্ত আদালতের সিদ্ধান্তে ঐকমত্য হলে অথবা চার সদস্যের মতৈক্য হলে তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি ৩–২ এ হয় তা হলে যে কোন পক্ষ ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এবং দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সহকারী জজের কাছে রিভিশন দরখাস্ত করতে পারেন। গ্রাম্য আদালতে কোন আইনজীবী থাকবে না। এবং উক্ত আদালত ৫,০০০/– টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলা গ্রহণ করতে পারেন অথবা ৫,০০০/–টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন। গ্রাম্য আদালত ঐ মূল্যমানের চুরি, জোচ্চোরী ইত্যাদির বিচার করতে পারেন। অনুরূপভাবে শহর এলাকায় বিশেষ সালিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর আওতায় সালিশ বোর্ড বিচারকার্য সম্পন্ন করে থাকেন। সালিশ বোর্ডের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলী গ্রাম্য আদালতেরই অনুরূপ।

পরিবারিক আদালত একটা বিশেষ ধরনের আদালত। বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, ভরণ–পোষণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৯৮৫ সনে উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আদালত পারিবারিক বিষয়ে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও সালিশী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত সহকারী জজদেরকে উক্ত আদালতের বিশেষ এখতিয়ার প্রদান করা হয়।

সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল আইন ১৯৮০ প্রণয়ন করেন। এটা একটা এক সদস্যবিশিষ্ট আদালত। প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পর্যায়ে অভিযোগের কোন প্রতিকার না পেলে ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী উক্ত আদলতে মামলা করতে পারেন। জেলা জজ পর্যায়ের এক সদস্য বিশিষ্ট উক্ত ট্রাইবুন্যালের বিরুদ্ধে দু'মাসের মধ্যে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুন্যালে আপীল করা যেতে পারে। উক্ত আপীল ট্রাইবুন্যালের সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের জজের মর্যাদা রাখেন এবং আরো দু'জন সদস্যের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ বেসামরিক কর্মচারী থাকতে পারেন। উক্ত আপীল ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় এবং সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগের এর উপর কোন আপীল শ্রবণ করার এখতিয়ার নেই।

শিশু আদালত ১৯৭৪ সনের শিশু আইন অনুযায়ী গঠিত। একজন প্রথম শ্রেণীর সার্বক্ষণিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারী সমন্বয়ে উক্ত আদালত গঠিত। মাসে সাধারণতঃ দুই, তিন বা ততোধিক বার উক্ত আদালত বসে। যে সব ব্যক্তির বয়স ১৬ বছরের কম থাকে তাদের মামলাসমূহ উক্ত আদালত পরিচালনা করে থাকেন। এ আইন ১৯৭৬ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর

---

৩৩ 'Award' means the determination by a Labour Court, Arbitrator or Appellate Tribunal of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award ; Vide Industrial Relations Ordinance 1969. Sec. 2(ii).

তারিখে ঢাকায় এবং ১৯৮০ সনের ১লা জুন তারিখে বাংলাদেশের সর্বত্র বলবৎ হয়। শিশু আদালতের ক্ষমতা আরোও কয়েকটি আদলতকে দেয়া হয়েছে। যথা—হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা জজের আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত, সহকারী দায়রা জজের আদালত, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। অপরাধে অভিযুক্ত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে আদালত বিচারের সময় উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিতে পারেন। ঘরোয়া পরিবেশে বিচারকার্য সম্পন্ন হয় বিধায় এ ধরনের মামলায় কোন উকিল রাখার প্রয়োজন হয় না। উক্ত আইনে শিশুদের জন্য রিম্যাণ্ডহোম ও সংশোধনী প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণ বিভাগ রিম্যাণ্ডহোমকে 'কিশোর হাজত' নাম দিয়েছেন এবং ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।[৩৪]

উপসংহার

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিচার কার্যের প্রধান সহায়ক দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি ও দণ্ড বিধি নানা অভিজ্ঞতার ফলে রচিত ও প্রণীত। কেবলমাত্র দেওয়ানী কার্যবিধি বৃটিশ আমলে ১৮৫৯, ১৮৭৭, ১৮৮২ এই তিনবার পরিবর্তিত হয়ে ১৯০৮ সনে চূড়ান্ত হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে দণ্ডবিধি প্রণয়ন লর্ড মেকোলের মেধা ও পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার ফল। ১৮৩৩ সনে বৃটিশ হাউস অফ কমন্সে সিদ্ধান্ত হয় যে বৃটিশ ভারতের জন্য পৃথক আইন ব্যবস্থা করা হবে। ১৮৪৫ সনে এ জন্য লর্ড মেকোলের সভাপতিত্বে একটি মিশন গঠন করা হয়। মেকোলে কমিশন কর্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি ১৮৫৬ সনে ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করা হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের জন্য বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে ১৮৬০ সনে আইনটি বিধিবদ্ধ এবং ১৮৬২ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে তা কার্যকর হয়। তেমনিভাবে ফৌজদারী কার্যবিধি অনেক চিন্তাভাবনার পরে ১৮৯৮ সনে প্রণীত হয়।[৩৫]

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রায় দু'শতাব্দী পরও বৃটিশ আমলে রচিত এ সব আইনসমূহ প্রায় অবিকৃতভাবে আমাদের কোর্ট-কাচারীতে কাজে আসছে। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু কোন আমূল পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ১৯৭৩ সনে ফৌজদারী কার্যবিধি নতুনভাবে বিধিবদ্ধ করছেন এবং একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসী ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী আলাদা করেছেন বটে, কিন্তু এর কার্যকরিতার পূর্ণমূল্যায়ন এখনও করা যায়নি।

তেমনিভাবে ১৮৬১ সনের পুলিশ আইন এবং ১৯৪৩ সনের পুলিশ প্রবিধি[৩৬] মাঝে মধ্যে কিছুটা সংশোধনীসহ এখনও চালু রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটা ব্যতিক্রমধর্মী আইন

---

৩৪ এ প্রসঙ্গে দেখুন-গাজী শামসুর রহমান, বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ (ঢাকা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১৯৮৩) পৃঃ-২৬৩-৬৬।

৩৫ ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণয়নের কারণসমূহ ও উদ্দেশ্যসমূহ গেজেট অফ ইণ্ডিয়া ১৮৯৭, পার্ট-৫, পৃঃ ৩৬৩ এবং এ সম্পর্কিত সিলেকশন কমিটির প্রতিবেদন গেজেট অফ ইণ্ডিয়া পার্ট-৫, পৃঃ ১৯-এ বর্ণিত হয়।

৩৬ ১৯৪৩ সনের পুলিশ প্রবিধি দ্বারা ইতিপূর্বে রচিত ১৯২৭ সনের পুলিশ প্রবিধি বতিল করা হয়।

DMP অধ্যাদেশ ১৯৭৬

ছিল। কিন্তু জারী করার পর পরই দেখা যায় যে উক্ত আইনটি প্রচলিত অনেকগুলো আইনের সাথে সাংঘাতপূর্ণ হয়েছে। ফলত ঐ বছরেরই শেষের দিকে প্রায় ডজনখানেক আইনের সংশোধন করতে হয়। তবুও দেখা যায় যে, পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব, চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বের মধ্যে বেশ ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে গেছে এবং এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।[৩৭]

আমাদের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বলে স্বীকৃত। কিন্তু বিচারের দীর্ঘসূত্রতা অনেকক্ষেত্রেই বিচারের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। একটা হিসাবে দেখা গেছে যে, হাইকোর্ট ডিভিশনে ১৯৮৪-৮৫ সনে ১৮,৫০০, ১৯৮৫-৮৬ সনে ২১,২০০, ১৯৮৬-৮৭ সনে ২৪,৭০০ মামলা বিচারাধীন ছিল।[৩৮] সার্বিকভাবে দেশের অন্যান্য অধঃস্তন আদালতে বহুসংখ্যক মামলা বছরের পর বছর নিষ্পত্তির অপেক্ষায় বিদ্যমান থাকার কারণে সরকার ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সনে যথাক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করতঃ তদন্ত, বিচার ও রায়ের সময়সীমা নির্ধারণের ফলে পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্বে আসার কথা। তদুপরি মিথ্যা মামলা দায়ের প্রমাণিত হলে বাদীর বিরুদ্ধেও ৬ মাসের জেল ও ৩,০০০/- টাকা জরিমানার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি মামলার সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে কিছুটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।[৩৯]

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের সরকারী নীতির সাথে সাথে উপজেলা পর্যায়ে বিচার কাঠামো বিকেন্দ্রীকরণেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন ১৯৮৩ সনে বিশেষ সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ৬৫০ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগের সুপারিশ করেন এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপা), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা) এবং ষ্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (এসটিআই)-তে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আইন ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দু'মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, ঐ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকেই তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র এক মাসের জেল দিতে পারতেন এবং দীর্ঘ এক বছর বা নয় মাসের প্রশিক্ষণ পাওয়ার পূর্বে এ ক্ষমতা অর্পিত হত না, সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যতীতই তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে একজন দু'বছরের জেল দিতে পারেন। কিছুদিন পূর্বে যখন কোন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাকরীচ্যুত হন, যিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন তিনি তাঁর আপীলে উল্লেখ করেন যে, তিনি পূর্বে একজন

---

৩৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ জন্য তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব শফিউল আজমের নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করেন এবং এ সম্পর্কে একটা গবেষণা হয়। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিটিকে সাহায্য করেন। ঐ উপলক্ষে ১৮৬৬ সনের কোলকাতা মেট্রোপলিটান পুলিশ আইন এবং উক্ত সনের কোলকাতা সাবারবান পুলিশ আইনও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

৩৮ The Bangladesh Observer p. 1c Colum. 6-7.

৩৯ Section 250 (5) of the Code of Criminal Procedure added by sec. 20 of Ordinance No. XXIV of 1982.

এর ক্ষমতা অর্পিত হতে দেখা যায়। কয়েক দশক পূর্বে যেখানে তিনি

আইনজীবি ছিলেন বিধায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁকে মাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এটা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।[৪০]

বিচার ব্যবস্থাকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা অবশ্য ৬০-এর দশকের শেষের দিক থেকে শুরু হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সনে পরীক্ষামূলকভাবে ৪২টি থানায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। ঐ সব থানা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে শুধু কমপ্লেইন্ট রেজিষ্টারের (সি-আর) মামলা করার ক্ষমতা দেয়া হয়, জেনারেল রেজিষ্টারের (জি-আর) মামলা করার ক্ষমতা দেয়া হয় নি। তদুপরি মহকুমা হাকিম ও থানা হাকিমের কমপ্লেইন্ট রেজিষ্টারের মামলা গ্রহণ করার সহবর্তমান (concurrent) এখতিয়ার ছিল। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে এক পক্ষ মহকুমা হাকিমের কোর্টে এবং অন্য পক্ষ থানা ম্যজিস্ট্রেটের কোর্টে একই সময়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করতেন। এক্ষেত্রে দু'পক্ষের দু'বার হয়রানী হতো। কোন কোন স্থানে (যথা পঞ্চগড়ে) মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য সি-আর কেস ও জি-আর কেস উভয়টাই বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

বর্তমানে উপজেলা ব্যবস্থায় অবশ্য ঐ সব অসুবিধা দূরীকরণ করা হয়েছে। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি-আর কেস ও জি-আর কেস উভয় ধরনেরই মামলা গ্রহণে এখতিয়ার প্রাপ্ত। তদুপরি একজন অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতি উপজেলাতেই বিদ্যমান। সরকার সে জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী ইত্যাদির ক্ষমতা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপরই ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু উপজেলা বিচার ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য অধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্লার্ক এবং অভিজ্ঞ আইনজীবির প্রয়োজন রয়েছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে রয়েছে।[৪১] এ মূলনীতি পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধানেও ছিল।[৪২] কেবল ১৯৬২ সনের আইউব খান রচিত পাকিস্তানের সংবিধানে তার উল্লেখ ছিল না। ইদানীং বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমাদের সুপিরিয়র কোর্ট অবশ্যই শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এমনকি জেলা ও দায়রা জজ থেকে শুরু করে সাব জজ/সহকারী সেশন জজও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন নন। কেবল ম্যাজিষ্টেসীর বেলায়ই শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্পষ্টতঃ মূল সমস্যা হচ্ছে যে, ম্যাজিস্ট্রেসী না থাকলে নিবারণমূলক ধারাসমূহ (Preventive sections) যথা : ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৬-১১০ (মন্দ জীবন যাপন সম্পর্কে ব্যবস্থা), ১৩৩ (জনগণের বাধা দূরীকরণ), ১৪৪ (শান্তি ভংগের আশংকা দূরীকরণ), ১৪৫ (জমি-জমা সংক্রান্ত শান্তিভংগের আশংকা দূরীকরণ), ইত্যাদির দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন। বিচার বিভাগকে এসব দায়িত্ব

---

৪০ M. Safiur Rahman and Abdus Salam, A Study of the Procedure for Adjudication of Grievances of Public Employees (Dhaka : BPATC, 1989), pp. 46-48 (Mimeo).

৪১ Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

৪২ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1956, Art. 30.

দিতে গেলে বিচারকরা প্রশাসনের সাথে জড়িত হয়ে পড়বেন, পক্ষান্তরে পুলিশকে এসব দায়িত্ব দিলে অনেকেই এর বিরোধিতা করবেন বলে আশংকা করা হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন আইন সম্পর্কে বিশেষতঃ নিজের অধিকার সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। লেখক একটি ফৌজদারী আদালতে মামলায় লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিবাদী আইনজীবি নিয়োগ করতে পারেননি এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাক্ষ্য সাবুদ হওয়ার পর রায়ের পূর্বে দাখিল করেছিলেন, যা পদ্ধতিগত কারণে গৃহীত হয়নি। এ ছাড়া মামলার মূল খরচ কম হলেও আনুষঙ্গিক খরচাদি অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে শহুরে ও গ্রাম্য টাউটরা বাদী বিবাদী উভয়কেই ভুল পথে পরিচালিত করে। অন্য দিকে দেখা যায় যে, সহকারী জজরা দীর্ঘ দিন কেবল দেওয়ানী মামলা করার পর সেশনস জজ পদে পদোন্নতির পর ফৌজদারী মামলা করতে গিয়ে বেশ একটু অসুবিধায় পড়েন। যাহোক, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার এবং আইন চর্চার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে আমাদের আইন ও বিচার কাঠামো পরিবর্তিত হতে পারে। হাদিসে আছে—'যে পেট পুরে খায় এবং তার প্রতিবেশী উপোষ যায় সে ঈমানদার নয়'। অথচ আমাদের আইন ব্যবস্থায় প্রতিবেশী না খেয়ে মারা গেলে তার পড়শীর শাস্তি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় সে যদি পড়শীর পাকশালায় ভাত চুরি করে ধরা পড়ে সে জন্য তার চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ৩৭৯ ধারায় শাস্তি হতে পারে। বিচারালয়ে সর্বকালে এবং সর্বদেশেই Justice according to law হয়ে থাকে। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস প্রমুখরা সকলেই প্রচলিত আইনের কারণে বিচারালয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন—এটা ইতিহাস স্বীকৃত। কাজেই আমাদের বিচার কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সাথে আইন ব্যবস্থার যথাযথ সংশোধন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৪৩]

---

৪৩ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো দেখুন—Azizul Hoque, The Legal System of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Institute of Law and International Affairs, 1980), pp. 19-64. Also Z. A. Shamsul Huq, M. Safiur Rahman and others, Handbook for the Magistrates (Dhaka : BPATC, 1985), pp. 1-17.

সহকারী